



মানের ক্ষেত্রে আপস নয়

রিফাত মুনীর ইতি

সারা দেশের এইচএসসি-র ফলাফল আরো একবার বিস্মিত করেছে ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের; যেহেতু এবারও শুধু পাসের হারই কমেনি, কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসিত করেছে আগের যাচাই প্রক্রিয়াকে। উচ্চশিক্ষা লাভের প্রাথমিক ধাপ এইচএসসি-র বাধা পেরোনো, যদিও পরবর্তী সময়ে একটা বিপুল শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও কর্মস্থলে প্রবেশের সুযোগ সীমিত। সমীক্ষা বলছে—দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেশি, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের পরও নিজেদের চাকরির বাজারে যোগ্যতম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে এই চিত্রটি সামগ্রিক বাংলার চিত্র নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই কর্মস্থলে বিভিন্ন জটিলতা, মানিয়ে নেবার অক্ষমতা, আয়-ব্যয়ের অসমতা, চাহিদা অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগে ব্যর্থতা মানুষকে নিত্য নতুন পেশায় জড়িয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে চাকরিপ্রার্থীর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। বলতে দ্বিধা নেই, প্রতিযোগিতা বেড়ে যাচ্ছে, যেহেতু একবার বিসিএস উত্তীর্ণও আছে ক্যাডার পরিবর্তন করার সুযোগ।

যাই হোক, বারবার যে কথাটা বলা হচ্ছে, তা হলো মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, যেহেতু এটি সমগ্র জীবনে কার্যকর। মনে রাখতে হবে, ভুরি ভুরি এ প্রাসঙ্গিকতার নিয়ে বিতর্ক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পর্যন্ত এতটা বাজেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তা শিক্ষা বোর্ডকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল। একজন বাংলায় এ প্রাসঙ্গিকতা মানে বাংলায় প্রায় আশি শতাংশ নম্বর তার দখলে। এখন বিগত রাংলা লেখা ও পড়ায় যদি তার কোনো ঘাটতি থাকে, তবে সেই শিক্ষার্থী পরবর্তী প্রত্যেকটি ধাপে শুধু যে সমস্যায় পড়বে তা না, বরং এই মানহীনতা, এই ঘাটতি তার আজীবনের সঙ্গী হয়ে যাবে। আমরা বর্তমান প্রজন্মকে দেখতে চাই,

মেধাবী ও একইসঙ্গে কর্মক্ষম। আর তাই ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে একটা নোট যে লিখবে, তাতে তার বানান ও ভাষাগত দক্ষতা প্রকাশ পাবে, এমন প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। এই ব্যাপারটা ইংরেজির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভাল ইংরেজি বলা ও লেখার অভ্যাস পরিত্যাগ করার প্রাথমিক ধাপটি হলো উচ্চ মাধ্যমিক। এই সময়েই একজন নবীন শিক্ষার্থীর মাথায় শক্ত করে বিষয়টি ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের বিষয়ভিত্তিক পাঠে অমনোযোগিতা কিংবা যে কোনোভাবে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রবণতাকে আটকে দিয়েছে এই পাসের নিম্নমুখী অবস্থান। রসায়নের মতো কঠিন একটি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নের যৌক্তিকতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে তেমনি প্রশ্ন উঠেছে সৃজনশীল প্রশ্ন বাড়ানোর যৌক্তিকতা নিয়েও। কিন্তু নিরীক্ষার এই বিষয়টি যদি যথাযথ হয়, তাহলে অন্তত শিক্ষা একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড পাবে এ কথা বলাই যায়। অন্যদিকে শুধু পাস কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার যোগ্যতা নয়—আমাদের শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক করে তোলে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এই ধাপটিতে আমাদের সন্তানরা মাদক কিংবা অন্য কোনো ধরনের নেশায় আক্রান্ত কি না, তারা অনৈতিক কাজে, জস্বিন্দে কিংবা নারী লাঞ্ছনার সঙ্গে জড়িত কি না এই বিষয়গুলোকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। পরিবারে, সমাজে, শিক্ষকদের কাছে একজন শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ হিসেবে বেছে ওঠার সুযোগ তৈরি করে দেবার দায়িত্বও আমাদের। প্রতি বছর পাস করা হাজার হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার মান নিয়ে, কেবল তাহলেই প্রশংসিত, লজ্জিত হতে হবে না।

শিক্ষাকে সহজলভ্য করার দিন প্রতিযোগিতামূলক বিশেষ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। মানের ক্ষেত্রে আপসহীন মনোভাব প্রমাণ করবে যোগ্যতমরাই টিকে থাকবে।

আমাদের উত্তর প্রজন্মের জন্য এ এক আগাম সতর্ক বার্তা।

ঢাকা

